যুগান্তর

সুস্থ ছাত্র রাজনীতিই পারে ক্যাম্পাস থেকে অনাচার তাড়াতে

প্রকাশ : ১৪ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. এম এ মাননান

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে প্রতিনিয়ত সংঘটিত তিনটি কুপ্রথা আর কুচর্চার কথা ইদানীং গণমাধ্যমে খুব জোরেশোরে প্রচার হচ্ছে। এগুলো হল র‌্যাগিং, বুলিং আর গেস্টরুম বা গণরুম নির্যাতন। এককালে আমরা র‌্যাগ-ডে'র কথা শুনতাম; কিছুটা দেখেছিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

র‌্যাগিং, বুলিং আর গেস্টরুম আতঙ্ক স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর জন্ম নেয়া তিনটি কুপ্রথা অথবা বলা যায়, তিনটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অনাচার। প্রথমেই বলে রাখি, 'র‌্যাগ-ডে' আর 'র‌্যাগিং' এক জিনিস নয়।

র‌্যাগ-ডে সাধারণত শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উৎসব করার জন্য পালন করে, জাস্ট নির্মল হৈ-হল্লা। তবে নির্মলতার মধ্যেও অনেক সময় আমরা দেখেছি, র‌্যাগ-ডে চলাকালে অশোভন কাজ হতো, যার ফলে অনেক প্রতিরোধ আর সমালোচনার পরে এটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় নির্মূল করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, র‌্যাগিং হল মারপিট, অপমান, হেনস্থা, সন্ত্রাসী ভঙ্গিতে মাস্তানি, নবীনদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি ইত্যাদি ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড। 'বুলিং' হচ্ছে র‌্যাগিংয়ের মতোই অশ্রাব্য কথার মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করা।

অন্যকে হুমকি-ধামকি দেয়া, তিরস্কার করা, রাগান্বিত কণ্ঠে তর্জন-গর্জন করা এবং নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করাই হল বুলিংয়ের মূল মর্ম। এই তিনটি কর্মের কোনোটিই সভ্য মানুষের জন্য শোভনীয় কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়।

র‌্যাগিং আর বুলিং অনেক বেড়েছে ইদানীংকালে। এ দুটি অপকর্ম ছাত্রসমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে, যার অতি সাম্প্রতিক বলি বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ; যাকে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষার্থী লাঠিপেটা করে মেরেই ফেলেছে। বিশেষ করে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে নষ্টের মূলে রয়েছে এই র‌্যাগিং আর বুলিং।

সবসময়ই আমরা দেখেছি, এ দুটি অমানবিক অপকর্ম সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনগুলোই বেশি করে থাকে। উদ্দেশ্য, নিজেদের আধিপত্য বিস্তার, প্রভাব-বলয় তৈরি ও ক্ষমতা জাহির করা। স্বাধীনতা-পূর্বকালে আমরা র‍্যাগ-ডে পালন করতে দেখেছি; কিন্তু র‍্যাগিং বা বুলিং ছিল না।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এগুলো ক্যান্সারের কোষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাম্প্রতিককালে কলেজগুলোতেও। বস্তুত ঈশান কোণে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে অনেক আগেই; কিন্তু যাদের এসব বিহিত করার কথা, তারা জমতে থাকা মেঘকে পাত্তা না দিয়ে সরু দৃষ্টিতে দেখেছেন। ফলে দিনে দিনে জমাট বাঁধা কৃষ্ণমেঘের আবর্তে জন্ম নিয়েছে অনেক দানব আর পিশাচ। এখনই এসব বন্ধ করা না হলে ছাত্রত্বের আড়ালে জন্ম নেবে আরও অনেক পিশাচ।

জনকণ্ঠের (১৩ অক্টোবর ২০১৯) একটি রিপোর্টে দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ র‍্যাগিংয়ের শিকার। কী ভয়াবহ কথা! অনেক ক্ষেত্রেই র‍্যাগিং ঘটে নীরবে, রাতের অন্ধকারে। বহু ছেলে বা মেয়ে শুধু শিক্ষাজীবন নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং অজানা আতঙ্কে মুখ খোলে না।

অনেকে ট্রমায় ভোগে, মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে, বিপর্যস্ত ভীতু মন নিয়ে ছাত্রজীবন শেষ করে। অনেকে লেখাপড়াই ছেড়ে দেয়। যারা উৎফুল্ল চিত্তে বিকৃত আনন্দের জন্য এসব করে, তারা নিজেরাও এরকম র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছে ভর্তি হওয়ার পরপরই; নবীন শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায়।

এরাই পরে সিনিয়র হয়ে একই কাণ্ড ঘটায় জুনিয়রদের ওপর। এ যেন দজ্জাল শ্রেণির ক্রুদ্ধ শাশুড়ির হাতে নববিবাহিতা পুত্রবধূর নির্যাতন। এ শাশুড়িও নববধূ থাকা অবস্থায় শাশুড়ি কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন। এভাবেই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে। কেউ এসব বন্ধের জন্য এগিয়ে আসে না।

আমার বিশ্বাস, র‍্যাগিং, বুলিং কিংবা গেস্টরুম আতঙ্ক কখনও বন্ধ হবে না; যদি রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া না হয়। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে গিয়ে পিছিয়ে আসে শুধু 'উপরের' হস্তক্ষেপের কারণে।

এই যে উপরের কথা বলছি, এ উপরটায় থাকে কারা? এরা রাজনীতির সুবিধাভোগী কিছু লোক, যারা নিজেরা নষ্ট এবং কামনাও করে একটা নষ্ট সমাজ তাদের আপন স্বার্থে। তারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, নগদ টাকা পকেটে দিয়ে লোভী করে তোলে, নষ্ট হওয়ার কলাকৌশলগুলো শিখিয়ে দেয় এবং তাদের পক্ষে লাঠিবাজি করার জন্য তালিম দেয়।

এদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনাচার কস্মিনকালেও বন্ধ করা যাবে না। গডফাদার না থাকলে 'গডসান'-এর জন্ম হবে না। শিক্ষার্থীদের যারা র‍্যাগিং আর বুলিং নামক অপকর্মে সহযোগিতা করে, প্রশ্রয় দেয় এবং কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে ফোঁস-ফোঁস করে ওঠে, তাদেরকে ধরা দরকার সর্বাগ্রে, যেমনটা করা হয়েছে এবং হচ্ছে অসৎ রাজনীতিক আর অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে।

এমনটি করা হলে শিক্ষাঙ্গন ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার পরিবেশ পাবে। তারা সঠিকভাবে লেখাপড়া করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে; নিু-মধ্যম আয়ের দেশটাকে টেনে নিয়ে যাবে উন্নত দেশের কাতারে।

র‍্যাগিং ও বুলিং অসুস্থ ছাত্র রাজনীতির ফসল। এখন ছাত্র রাজনীতির নামে যা চলছে, তা আসলে বঙ্গবন্ধুর আমলের ছাত্র রাজনীতির বিপরীতে অপরাজনীতি এবং মূলত ছাত্রসন্ত্রাস। ছাত্র রাজনীতির মধ্যে অসুস্থতা ঢুকাচ্ছে রাজনৈতিক দলের কতিপয় অসুস্থ মানসিকতার নেতাকর্মীরা। ওই মানুষগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা করা দরকার আগে।

শুদ্ধি অভিযান শুরু করতে হবে ওখানে। সময় বয়ে যাচ্ছে। এমনটি চলতে থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যার তিল তিল করে অর্জিত সাফল্যগুলো অসুস্থ রাজনীতিকরা গোগ্রাসে গিলে ফেলবে।

মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কুচক্রী মৌলবাদী, জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা আর তাদের পাতে ঘি ঢালতে থাকবে স্বাধীনতাবিরোধীরা। ইতিমধ্যে আলামত দেখাও দিয়েছে। অনেকে জোরেশোরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য রীতিমতো রাস্তায় নেমেছে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না; বন্ধ করা হলে খালি মাঠে নেমে পড়বে দেশপ্রেমহীন কুচক্রীরা। ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় আনাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

যদি ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনের ভেতরে রেখে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা যায়, যদি ছাত্র- নেতাকর্মীরা বহিরাগতদের বর্জন করে নিজেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করে, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে, যা এ সময়ে খুবই জরুরি তাহলে এমনিতেই ছাত্র রাজনীতির মধ্যে গুণগত পরিবর্তন চলে আসবে।

পা কেটে গ্যাংরিন সারানোর চিন্তা থেকে দূরে সরে এসে গ্যাংরিন চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই বিধেয়। আবেগের বশে কিংবা কিছু ছাত্রসন্ত্রাসের ভীতিকর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে হয়তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা কেউ বলতেই পারে।

তবে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, আসলে র‍্যাগিংসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অপকর্মগুলো শুধু ছাত্র রাজনীতির কারণে হয় না; হয় অপরাজনীতির কারণে, দিকভ্রান্ত শিক্ষার্থীদের মিসগাইডেড হয়ে সরল রাস্তা থেকে বক্র রাস্তায় চলে যাওয়ার কারণে, লোভের আগুনে পা দেয়ার কারণে, প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার মোহের কারণে।

প্রতি বছর নিয়মিত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হলে, শুধু প্রকৃত ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারলে, বহিরাগত টাউটদের ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া বন্ধ হলে, সর্বোপরি উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক সমর্থনসহ সক্রিয় সহযোগিতা থাকলে ছাত্র রাজনীতি সুস্থ ধারায় ফিরে আসবেই।

সুস্থ ছাত্র রাজনীতিই ক্যাম্পাস থেকে পিশাচ তাড়াবে। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা মুক্তচিন্তা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে উঠুক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। অপসংস্কৃতি, অনাচার, র‍্যাগিং-বুলিং ইত্যাদি চিরতরে চলে যাক বিস্মৃতির অতলে।

কাগুজে মেধাবী না হয়ে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠুক সৃজনশীল, উদ্ভাবনমনস্ক, প্রগতিশীল, বাঙালি জাতির চিরাচরিত মূল্যবোধে উজ্জীবিত উদারমনা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বনাগরিক, সুশিক্ষিত সমাজদরদি, দেশপ্রেমী সুযোগ্য সূর্যসন্তান; চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম প্রাণচঞ্চল কর্মী ও নেতৃত্বগুণে সমৃদ্ধ সৎ ও বিবেকবান মানুষ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্মোহভাবে, অপরাজনীতি-তাড়িত না হয়ে, কারও কথায় উঠবস না করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিলে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছবে। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে- কেন আজকের এরকম অসম্মানজনক দশা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের?

কেন স্টেকহোল্ডাররা (অংশীজন) আঙুল তুলে কথা বলতে সাহস পায়? কোথায় আমাদের গলদ ও ব্যর্থতা? আমাদের শক্তিশালী দিকগুলো কী আর দুর্বল দিকগুলোও কী? ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুযোগগুলো কেন আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না?

প্রতিকূল বিষয়গুলো মোকাবেলা করব কীভাবে কখন? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- আমরা প্রশাসনিক দিক থেকে দিন দিন দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি কী কারণে? শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিত (অন্তত বছরে একবার) 'সদুঅপ্র' (সবলতা, দুর্বলতা, অনুকূল, প্রতিকূল) বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, আমাদের পরিবেশগত অবস্থার কী 'অবস্থা', কোথায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান, কেন এটা-ওটা ঘটছে, কীভাবে ঘটছে, কারা ঘটাচ্ছে?

নিজেদের শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দুর্বলতা যেমন দূর করা সম্ভব, তেমনি প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠাও সম্ভব। প্রশাসকদের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানকে হতে হবে বিচক্ষণ, কুশলী, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাহী; যিনি যে কোনো স্তরের কর্মীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মতামত বা সুপারিশ গ্রহণ করতে লজ্জা পাবেন না।

পদের প্রতি মোহ থাকলেই জন্ম হবে যত সব বিড়ম্বনার। যিনি রিজিকের মালিক, ভরসা রাখতে হবে শুধু তার ওপর। বিশ্বাস রাখতে হবে, রিজিক কখনও কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যারা প্রশাসনিক ক্ষমতায় থাকেন, তারা সত্যিকার অর্থে স্রষ্টার কাছ থেকে বিচারিক আসন পেয়ে থাকেন। ওই আসনে থেকে সঠিক কাজটি না করলে তার জন্য কৈফিয়ত দিতেই হবে। প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব না দিয়ে কেউ পার পাবে না।

ড. এম এ মাননান : কলামিস্ট; উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।